আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১৩-১২-০৯ তারিখে প্রদর্শনী
বিষয় - মহাবিশ্ব, চন্দ্রায়ন, ধূমকেতু
বক্তা - ড. অমলেন্দু বান্দ্যোপাধ্যায়
সময় - বিকাল ৩ টা
আয়োজক - কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৬ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর /২০০৯ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

আঙুরের বিচিত্র কাহিনী

আঙুর সুস্বাদু রসালো ফল হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পরিচিত। আঙুর সর্বপ্রথম বিদেশ থেকে ভারতে আসে। পূর্বে সযত্নে তুলার আধারে আঙুর আমদানি করা হতো। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আঙুর হয়। কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণে এবং বিশেষ করে আর্মেনিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলে আঙুরের লতানো গাছ জন্মায়। লতা ছাঁটাই করে দিলে প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়। কাশ্মীর, কাবুল, এমনকি হিন্দুকুশের উত্তরেও অবাধে আঙুর জন্মাবার কথা উল্লিখিত আছে। ইউরোপ ও এশিয়াতেও মানুষের বসতির পূর্বেই পশু-পাখির সাহায্যে আঙুর বিস্তার লাভ করেছিল। সেমিটিক জাতি ও আর্যরা আঙুর বা দ্রাক্ষা হতে উৎপন্ন সুরার ব্যবহার জানত এবং খুব সম্ভব দেশত্যাগ করে ভারতবর্ষ, মিশর ও ইউরোপের যেসকল দেশে তারা নতুন বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানে আঙুর চাষেরও চলন করে। মিশরে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্ব থেকে আঙুর চাষের প্রচলন ছিল। কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তার লাভ ঘটে অনেক পরে। হয়তো সুরাসক্ত ভারত বিজয়ীরাই এ দেশে

এরপর 7 পাতায়

রাধানাথ সিকদার
প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী

'ইনি ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল।' মন্তব্য 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের খ্যাতনামা লেখক শিবনাথ শাস্ত্রীর। জন্ম ১৮১৩। আর মাত্র তিনবছর পর এই মনীষী দ্বি-শতবর্ষে পদার্পণ করবেন। আমরা কি তাঁকে স্মরণে ও শ্রদ্ধায় বরণ করে নিতে প্রস্তুত! রাধানাথ সিকদার। আধুনিক ভারতের প্রথম গণিতজ্ঞ-বিজ্ঞানী। ১৮০২ সালে ব্রিটিশরা এদেশে কর্নেল ল্যাম্টন-এর অধীনে স্থাপন করেন গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে (জি টি এস)। উদ্দেশ্য, দেশজুড়ে জমি জরিপের কাজ, ম্যাপ প্রণয়ন ইত্যাদি। ল্যাম্টনের মৃত্যুর পর ১৮২৩ সালে এই কাজের দায়িত্ব নিলেন খ্যাতনামা গণিতবিদ জর্জ এভারেস্ট (১৭৯০-১৮৬৬)।

এই কাজ করতে ট্রিগোনোমেট্রি (ত্রিকোণমিতি) জানা গণিতবিদের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। এভারেস্ট সাহেব এলেন হিন্দু কলেজে অঙ্ক জানা ছাত্রের প্রয়োজনে। বাকীটা নিজেই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা গণিত অধ্যাপক জন টাইট্‌লার রাধানাথকে জর্জ এভারেস্টের হাতে সঁপে দিলেন। 'ছেলেটি অত্যন্ত দক্ষও প্রতিভা সম্পন্ন' — টাইট্‌লারের এই প্রশস্তি রাধানাথ কাজের মাধ্যমে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। 'সিকদার' পদবীর অর্থ হল এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায়রাখার পুলিশি দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকার। নবাবী আমল থেকেই চলে আসছিল এই সম্মান। ইংরেজরা এসে অবশ্য এই দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নেয়। প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। সময়টা ছিল ১৮৩০-৩২।

প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, রেনেসাঁসীয় চিন্তার অন্যতম বিপ্লবসৃষ্টিকারী ঝড় ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। সেদিনের কলকাতা কাঁপাচ্ছে গুটিকয় তরুণ ছাত্র — রসিক কৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও ৫/৬টি নাম। রাধানাথকে বুঝতে 'ডিরোজিও

এরপর 2 পাতায়

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ

২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপুঞ্জের ৬২তম সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০০৯ সালটিকে 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ' (International year of Astronomy) হিসাবে পালন করা হবে। এই বর্ষ উদ্‌যাপনের যৌথ দায়িত্বে আছে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়িন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গ্যানাইজেশন (UNESCO) এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU)।

আন্তর্জাতিক জ্যোর্ত্বিজ্ঞান বর্ষের মূল ভাবনা 'The universe – yours to discover'। এর অর্থ মহাবিশ্বের মধ্যে আমি একটি ছোট বিন্দু। আমি মহাবিশ্বেরই অংশ। আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে আরেক মহাবিশ্ব। এই দুই মহাবিশ্বের স্বরূপকে জানতে হবে। তাদের মধ্যকার যোগসূত্রকে উপলব্ধি করতে হবে।

চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারাদের সাথে আমাদের গভীর সংযোগ আছে। আমাদের সৃষ্টি, বেড়ে ওঠা, প্রাত্যহিক জীবনচর্চা এসব কিছুর সাথে গভীর যোগাযোগ আছে মহাজাগতির বস্তু ও ঘটনার। এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই

এরপর 5 পাতায়

রাধানাথ সিকদার

1 পাতার পর

আগুনের' উত্তপ্ত ঝড়কে উপলব্ধিতে রাখতে হবে। প্রগতিশীল চিন্তা, পুরনোকে অস্বীকার, সংস্কারকে বর্জন, বিধবা বিবাহ সমর্থন, নারীশিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানমনস্কতাকে আবাহন — এসবের এক পূর্ণ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন রাধানাথ সিকদার।

রাধানাথ জরিপ বিভাগে চাকুরি করেন ১৮৩২ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত। এজন্য তাঁকে বেশিরভাগ সময়টাই কলকাতার বাইরে থাকতে হত। জরিপের কাজে জর্জ এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্স-রে সিস্টেম'-এর হাতেকলমে বাস্তব প্রয়োগ ঘটে রাধানাথের হাতে। দেরাদুনে ছিল জরিপ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অফিস। এখানে মুখ্যত গণনার (অঙ্ক কষা) কাজ হোত। 'মাউন্ট এভারেস্ট' নাকি রাধাচূড়া নিবন্ধে (উৎস মানুষ- জুলাই ২০০৯) আশীষ লাহিড়ী লিখেছেন, 'সে বড়ো জটিল কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর ত্রিকোণমিতি খুব ভালো করে না জানলে সে কাজ করা যায় না। প্রথমে কোনো একটা জায়গা থেকে ভারী লোহার চেন দিয়ে কয়েক মাইল লম্বা একটা সরলরেখা টানতে হয়। তারপর দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের কোনো চেনা তারার অবস্থান দেখে তার সঙ্গে মাটিতে টানা ঐ সরলরেখার একপ্রান্তকে মিলিয়ে একটি অসমাপ্ত ত্রিভুজ আঁকতে হয়। সেই অসমাপ্ত ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য আর কোণ মেপে ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা দিয়ে তিন নম্বর বাহুর দৈর্ঘ্য হিসেব করে বার করতে হয়। তখন গোটা ত্রিভুজটার আয়তন মেপে জরিপের কাজ চলে। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, ও পাহাড় থেকে সে পাহাড়। এ উপত্যকা থেকে সে উপত্যকা। এ ত্রিভুজ থেকে ও ত্রিভুজ। আঁকা হয়ে চলে ম্যাপ।'

১৮৪৩ সালে জর্জ এভারেস্ট অবসর নিয়ে বিলেত ফিরে গেলেন। ওই জায়গায় বসলেন কর্নেল ত্যানড্রু ওস। তিনি রাধনাথকে ১৯৫১ সাল নাগাদ কলকাতার অফিসে নিয়ে আসলেন। রাধানাথ নিবিড়ভাবে ব্যাপৃত থাকলেন এতদিনকার সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যাদির নির্ভুল গণনা কাজে। উদ্দেশ্য হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির সঠিক উচ্চতা পরিমাপ। এরকমই একটি অতি উচ্চ শৃঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়েছিল '১৫ নং চূড়া' হিসাবে। দুটি বিভিন্ন অবস্থান থেকে নেওয়া মাপজোক থেকে বারবার গণনা করে ঐ চূড়ার উচ্চতা বেরোলো ২৯০০২ ফুট। এই উচ্চতা নির্ণয়ে বায়ুতে আলোক রশ্মির প্রভাবজনিত ত্রুটি এবং বরফের উপর আলোর প্রতিফলনজনিত বিভ্রম — এই দুটি বিষয়কেও ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে তিনি এই মহাগণনা কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারিভাবে জমা দিলেন।

অধিকর্তা আনড্রু সাহেব বিলেতের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে বিষয়টা জানালেন। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হোল এই সিদ্ধান্ত — ১৫ নং চূড়াই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতার অধিকারী। কে এর আবিষ্কর্তা? এই চূড়ার নামকরণই বা কী হবে? জর্জ এভারেস্ট সাহেব একটি নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন নামকরণের ক্ষেত্রে। শৃঙ্গের নাম হবে স্থানীয় মানুষের দ্বারা চিহ্নিত নামে। সেভাবেই এসেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী, ন্যাঙ্গা পর্বত, মাছের পুচ্ছ ইত্যাদি। ওই উচ্চ শৃঙ্গটির (১৫ নং) স্থানীয় নাম সাগরমাথা, চোমো লাংমা, কেউ বলে দেওধুঙ্গা (দেবতার পাহাড়), কেউ বা জোমোকংকর। এই শৃঙ্গের একদিকে নেপাল, অন্যদিকে তিব্বত। ফলে নেপালিদের ডাকা নাম ব্যবহার করলে তিব্বতীরা রেগে যাবে। সেরকম তিব্বতীদের দেওয়া নামও ব্যবহার করলে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শেষমেশ সরকারিভাবে ঘোষিত হোল — শৃঙ্গের নাম এভারেস্ট। কারণ জর্জ এভারেস্ট প্রকৃত অর্থে এই মহাযজ্ঞের প্রধান বৈজ্ঞানিক হোতা ও সংগঠক ছিলেন। কিন্তু এর আবিষ্কর্তা কোনো সরকারি নথিতে রাধানাথের এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক কৃতীর কোনো স্বীকৃতি দেখা যায় না।

Funk & Wagnalls new Encyclopedia (Vol. 9) পৃষ্ঠা ২৭৪- এ উল্লেখ আছে, 'According to an Indian Government survey. undertaken in 1954, the summit is 29028 ft. above sea level. The English name conmemorates Sir George Everest (1790-1866), surveyor general of Indian from 1830 to 1843. who in 1841 first recorded, the location and height of the mountain.' এমন ভুল তথ্য প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা, নির্জিব (?) ভারতীয়রা এটাই ভবিতব্য বলে অম্লান বদনে মেনে নিয়েছি কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই!

না একটা ঘটনায় একটি প্রতিবাদের বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু ১৮৯৮ সালে 'The History of Hindu civilization during British Rule (৩য় খণ্ড) প্রকাশ করেন লন্ডন থেকে। বইটি অতি উচ্চ প্রশংসিত বিদ্বৎমহলে। এই বইতে রাধানাথ সিকদার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে (পৃষ্ঠা- ১০১-১০২)।

' Radhanath Shikdar was for sometime chief computer in the Survey of India Department. The following mention is made of him in the preface to the first edition of the 'Manual of Surveying' by smyth and thuillier :–

' In parts III and IV the compilers have been very largely assisted by Babu Radha Nath Shikdar, the distinguished head of the computing Department of the great Trigonometrical Survey of India, a gentleman, whose intimate acquaintance with the rigorous forms and mode of procedure adopted on the great trigonometyrical survey of India, and great acquirements and knowledge of scientific subjects generally, render his aid particularly valuable. The chapters 15 and 17 upto 21 inclusive, and 26 of part III, and the whole of part V are entirely his own, and it would be difficult for the compilers to express with sufficient force the obligations they thus feel under to him, not only for the portion of the work which they desire thus publicly to acknowledge, but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own Department.' [H.J.S. cotton লিখিত 'New India' — পৃষ্ঠা ৪১-৪২]

১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম এই সার্ভে ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়। বইটি অচিরেই সার্ভে কাজে অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৮৫৫ সালে বইটির ২য় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে এর ৩য় মুদ্রণ প্রকাশিত হলে দেখা যায়, বইটির ভূমিকাটি সম্পূর্ণরূপে উধাও। বইতে রাধানাথের কোনো নামগন্ধ নেই। ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে নানা মহল থেকে। নেটিভ বলে বৃটিশ আভিজাত্যে আঘাত করছিল?

এরপর 3 পাতায়

রাধানাথ সিকদার

2 পাতার পর

Col. Sherwill লিখিত Friend of India (১৮৭৬ সালে বইটি প্রকাশিত হবার সামান্য পরে) গ্রন্থে রয়েছে তীব্র প্রতিবাদ, "... when bringing on a third edition & Smyth and Thullier's Manual of Surveying for India' the much respected name of the late Babu Radhanath Shikdar, the able and distinguished head of the computing department of the Great Trigonometrical Survey of India, who did so much to enrich the early editions of the 'Manual', had been advertently or inadvestently, removed fromthe preface of the last edition; while at the same time all the valuable matter written by the Babu had been retained, and that without any acknowledgement as to the authorship.'

দ্ব্যর্থহীন ভাষা তিনি আরও লিখেছেন, 'I feel quite ashamed for those who have seen fit to exclude his name from the present edition ...' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কর্নেল শেরউইল ভারতীয় রেভেনিউ সার্ভেয়র দপ্তরে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং রাধানাথ সিকদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। (আরও জানার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ- 'Reminiscences and Anecdotes' by Ramgopal Sanyal, P. 25).

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান গ্রন্থে ভুল উলেখ রয়েছে। এখানে 'Auixiary Table (১৯৫১) এবং 'The Manual of Surveying' গ্রন্থের প্রণেতা বলে রাধানাথ সিকদারের নাম বলা হয়েছে। এটা ঠিক নয়।

প্রসঙ্গত আগ্রহী পাঠককে প্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞান ইতিহাসের গবেষক সিদ্ধার্থ ঘোষের একটি নিবন্ধ পড়তে অনুরোধ করব। 'কলের শহর কলকাতা' গ্রন্থের একটি নিবন্ধ' এভারেস্ট প্রমাণ মহসীন ও আরও কয়েকজন' (পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৮)। এই নিবন্ধ পাঠে জানা যায় সৈয়দ মহসীন ছিলেন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভে কাজের উপযোগী যন্ত্র নির্মাতা (ইন্সস্ট্রুমেন্ট মেকার)। এই রচনায় রাধানাথ সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে অসাধারণ গণিতজ্ঞ, আবহাওয়াবিদ ও সার্ভে কাজে অতুলনীয়ভাবে দক্ষ রাধানাথের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দিকটি প্রায় অনালোচিত। তিনি কতভাবে সমাজসেবী, দেশপ্রেমী, সাহিত্যানুরাগী-স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে একনিষ্ঠ ডিরোজিয়ান ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। প্রায় ২০০ বছর উত্তীর্ণ হতে গেল রাধানাথের জন্মের সময় থেকে। নব্য ভারতের সর্বপ্রথম এই গণিতজ্ঞ-বিজ্ঞানীকে কি আমরা যথাযোগ্য সম্মানের আসনে বসিয়েছি? অন্যকে দোষ না দিয়ে নিজেদের অযোগ্যতার পরিমাপকে ঢের জরুরি বলে মনে করি।

— দীপক কুমার দাঁ, ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

পত্রিকার বার্ষিক সম্মেলন

রানাঘাট ঃ আনুলিয়া কেদারনাথ স্মৃতি পাঠাগার হলঘরে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পত্রিকার ৪০তম সংখ্যা উদ্বোধন করেন বিজ্ঞানকর্মী সুমন চন্দ। 'জলদূষণ ও তার প্রতিকার' শীর্ষক পুস্তিকার উদ্বোধন করেন সম্পাদক শিবপ্রসাদ সরদার। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় শতাধিক বিজ্ঞানকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দীপক কুমার দাঁ, ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পাচু রায়, সুব্রত বিশ্বাস, বিকাশ রায়, বিবর্তন ভট্টাচার্য, তপন কুমার দাস, বিজয় সরকার প্রমুখ।

আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবিতে স্মারকলিপি

রানাঘাট, নদীয়া ঃ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে ২৪ আগস্ট রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ সুচারু রঞ্জন হালদারকে আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবিতে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় চাকদহ ও হরিণঘাটা ব্লকের কয়েকহাজার জলের নমুনা স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন কলকাতা, সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা গেছে বেশিরভাগ জলের নমুনাই ভীষণভাবে আর্সেনিকমুক্ত। চাকদহ ও হরিণঘাটা ব্লকের বহু মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়ে মারা গেছেন। বেশ কয়েক হাজার মানুষ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। সংস্থার পক্ষ থেকে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, পি.জি. হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রোগীদের পাঠানো হচ্ছে।

স্থানীয়ভাবে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে এ বিষয়ে বহুবার বলা সত্ত্বেও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সদস্য-এর কাছে স্মারকলিপিতে প্রধান দাবিগুলি হল —

১। আর্সেনিকমুক্ত জল বিনামূল্যে হরিণঘাটা ও চাকদহ ব্লক সহ নদীয়ার সর্বত্র সরবরাহ করতে হবে।

২। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্য চালু করতে হবে।

৩। জল পরীক্ষার কাজে সরকারেক উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। আর্সেনিক দূষণে মারা যাওয়া পরিবারদের ১ লক্ষ টাকা সরকারী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বিজ্ঞান দরবারের বার্ষিক সম্মেলন

কাঁচরাপাড়া ঃ ২৯ আগস্ট কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার সংস্থার ২১তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন সদস্যরা বিগত বছরগুলির বিভিন্ন কর্মীসভার কথা বলেন। সদস্যরা আগামী দিনে সংস্থার জনমুখী কর্মসূচীগুলি আরো ব্যাপক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। সম্মেলনে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের যে কর্মসূচীগুলির সিদ্ধান্ত হয় তা হল —

১। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচী যথা, পুস্তিকা, পত্রিকা প্রচার, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি হাতে-কলমে করে দেখানো প্রভৃতি। ২। নিরাপদ ও আর্সেনিকমুক্ত জলের দাবিতে সর্বস্তরে প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি জলের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ৩। মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্তরে কর্মসূচী। ৫। বিজ্ঞান পত্রিকা, পুস্তিকা প্রকাশ করা।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শিবপ্রসাদ সরদার। আগামী ১ বছরের জন্য ১১ জনের কার্যকরী সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্পাদক ও সভাপতি পদে যথাক্রমে বিজয় সরকার ও ডঃ গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয়।

স্থূলত্ব ঃ বিভিন্ন দিক

মহাভারতে পঞ্চপান্ডবের দ্বিতীয় ভাই ভীম প্রচুর খেতেন এবং সেই কারণে তাঁর দেহে প্রচুর মেদ ছিল। তবে তিনি কিন্তু ছিলেন যথেষ্ট শক্তিমান।

চিকিৎসাশাস্ত্র মতে, একজন পুরুষের মোট ওজনের প্রায় ২০ শতাংশ এবং একজন স্ত্রী-লোকের মোট ওজনের প্রায় ২৫ শতাংশের বেশি চর্বিজাতীয় পদার্থ যদি দেহে থাকে, তবে তাদের মোটা বলা হয়। তবে রোগা বা মোটা কোনো দলেই পড়েন না এমন মানুষের চর্বি, মোটা মানুষের তুলনায় শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ কম হতে হবে। এখন প্রশ্ন — এই বাড়তি চর্বি শরীরে কীভাবে জমা হয়? এর উত্তর পেতে হলে জানতে হবে শরীরের কোষগঠন প্রণালী। আমাদের শরীরে ফ্যাট সেল বা স্নেহ কোষ বলে এক ধরনের কোষ আছে। এর মধ্যে চর্বি জমা থাকে। এখন এই কোষগুলির সংখ্যা বাড়লে চর্বির পরিমাণও বেড়ে যায়। চর্বি বাড়া মানেই শরীরের মেদবৃদ্ধি অর্থাৎ রোগা থেকে মোটা মানুষ। এখন মোটা হওয়ার একটি বড়ো কারণ হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া। প্রতিদিন আমরা যা খাই তা নানা কায়িক পরিশ্রমে খরচ হয়। যাঁরা বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন তাঁদের শরীরে মেদ বা চর্বি জমার সম্ভাবনা কম। শরীরের মোট শক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ পেশীর কাজে খরচ হয়। এখন খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক পরিশ্রম করলে শরীরে মেদের পরিমাণ বেড়ে যাবে। মোটা হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির নিঃসরণের তারতম্য।

এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে নির্গত একটি বিশেষ হরমোনের পরিমাণ খুব বেশি হলেই শরীরের কয়েক স্থানে চর্বি জমতে শুরু করে। এছাড়া থাইরয়েড গ্রন্থির গ্রন্থিরস কমে গেলেও চর্বি জমতে পারে। বংশগতির নিয়ম অনুযায়ী একজন মানুষের দেহে মেদকোষের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। তবে বেশি বয়সে বিভিন্ন কারণে মেদকোষের সংখ্যা বাড়তে পারে। একটি মোটা শিশু যে উত্তরকালে একজন মোটা মানুষে পরিণত হবে, একথা অনুমান করা স্বাভাবিক। আমরা জানি, হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থি দ্বারাই ক্ষুধা ও তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে এই কেন্দ্রটি সঠিকভাবে কাজ না করলে, খাদ্যের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায় এবং তার ফলে মোটা মানুষ বেশি খেয়ে আরও মোটা হয়ে যান। একজন মানুষের শারীরিক ও বিপাকীয় কার্য ঠিকভাবে হতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্যালরি যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তার বেশি খেলে শরীরে মেদ জমা হয়। খাদ্যে শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে মোটা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। প্রতি কিলোগ্রাম মেদ সঞ্চয়ের ফলে দেহের রক্তবাহী নালীর দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। তাই হৃৎপিন্ডকে আরও বেশি কাজ করতে হয়। যে সব মহিলা সংসারের কাজকর্ম বিশেষ করেন না, শুধু খান আর ঘুমোন, তাঁরা সহজেই মোটা হয়ে যান।

যান্ত্রিক সভ্যতার যত উন্নতি হচ্ছে মানুষের কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজনও তত কমে যাচ্ছে। সব লোকের ক্যালোরির চাহিদা সমান নয়। ছোটোখাটো আকৃতির ও অলস প্রকৃতির মানুষের ক্যালরি চাহিদা কম। সুতরাং এমন লোকেরা বেশি খাদ্য খেলে, সেই খাদ্যের কিছুটা উদবৃত্ত থেকে যেতে পারে।

এখন একজন স্থূলাকার পরুষ একজন স্থূলাকার নারীর থেকে কম কর্মক্ষম (Less fit) বলে কিছু গবেষক মত প্রকাশ করেছেন। কারণস্বরূপ তাঁরা বলেছেন, স্থূলাকার পুরুষ সহজেই বহুমূত্র রোগ বা তার আগের অবস্থার পৌছান। সেইসময় তার তলপেটে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়। ৫৬ জন রোগগ্রস্থ অস্বাভাবিক মোটা পুরুষ ও নারীকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তাঁরা প্রত্যেক ওজন কমানোর জন্য শল্যচিকিৎসকদের কাছে গিয়েছিলেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাঁরা বেশিমাত্রায় পরিশ্রম করতে সক্ষম। এই ব্যাপারটা নির্ভর করছে কি পরিমাণ চর্বি শরীরে আছে তার উপর। নেদারল্যান্ডের Reiner de Graaf হাসপাতালের ডাক্তাররা এই ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। একজন মানুষ কীভাবে শর্করা ও অন্যান্য সহজ কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করছে তার উপরে এই ব্যাপারটা নির্ভরশীল। তাঁরা বলেন, বেশিরভাগ স্থূলাকার পুরুষ বহুমূত্র রোগের আগের অবস্থায় চলে আসে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট সহনক্ষমতা তাদের কমে যায়। এর ফলে তাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়।

— কমল চক্রবর্তী,
২৫২২-৬০৩৪

With Best Compliments From —
ALBATROSS SCHOOL
42, Basanta Babu Road
Kasnchrapara, 24 Pgs. (N)
English + Bengali Medium
NURSERY TO CLASS VIII
Ph : 9330822071

জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ

1 পাতার পর

উপলব্ধিকে ব্যাপৃত করার জন্য ২০০৯ সালটিকে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০০৯ সালটিকেই কেন আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হল? আজ থেকে ৪০০ বছর আগে বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (Galileo Galilei) স্ব-নির্মিত একটি দূরবীনের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজে এই হল দূরবীনের প্রথম ব্যবহার। শুরু হল দূরবীন-ভিত্তিক জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা। তাঁর এই কীর্তিকে সম্মান জানাতেই বর্ষব্যাপী, বিশ্বজোড়া এই আয়োজন। এছাড়া এ বছরটি কেপলারের গ্রন্থ 'Astronomica Nova' প্রকাশেরও ৪০০ বছর।

১২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও এক সময় বিশ্বের গঠন সম্পর্কে একটি মতবাদ দেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লডিয়াস টলেমী (Claudius Ptolemy)। তাঁর লেখা 'Almagest' গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর মতে বিশ্বের কেন্দ্র রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবী স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে স্থির তারাদের গোলক। গোলকটি ঘুরতে সময় নিচ্ছে একদিন। গোলকে আবার সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলি পৃথক পৃথক গোলকীয় পথে ঘুরছে। এটি ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব (Geocentric theory)। টলেমীর এই ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব চার্চ মেনে নেয় এবং চার্চের শক্তিশালী সমর্থনে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬০৯ সালে। তিনি তাঁর তৈরি চার সেন্টিমিটার ব্যাসের দূরবীনটিকে আকাশের দিকে তাক করলেন। শুরু হল পরীক্ষামূলক জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করলেন 'The Starry Messenger' নামক গ্রন্থে ১৬১০ সালে। তিনি আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky way galaxy)-এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। গ্যালাক্সিটি যে অসংখ্য পৃথক পৃথক তারার সমষ্টি তাও বোঝা গেল তাঁর দূরবীনে। তিনি দেখলেন চাঁদের পৃষ্ঠদেশের প্রকৃত চেহারা, বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তার চারটি চাঁদ, শনিগ্রহের বলয়, চাঁদের কলার মত শুক্রগ্রহেরও কলা পরিবর্তন।

এসবের কোনটিই ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করে না। কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করে। এ আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিওকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। যাক সে কথা। রোমের পোপের দপ্তর থেকে গ্যালিলিওর আবিষ্কার স্বীকৃতি পেতে সময় লেগে গেল ৩৮৪ বছর। ১৯৯৩ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন যে তাঁর পূর্বসুরীরা গ্যালিলিওর বিচার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন। গ্যালিলিও-ই সঠিক। বোঝা গেল, ধর্মীয় গোঁড়ামি একদিন ভেঙ্গেছে। বিজ্ঞানের জয় হয়েছে। ১৬০৯-এর চারশো বছর পর এই বছরটিকে সঠিকভাবেই আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহাকাশের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াসে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে সেই বিষয়ে সচেতনতা জাগাতে এগিয়ে এসেছে বহু দেশ ও সংস্থা। ১৪০টি দেশ ও ৩৮টি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এ কাজে সামিল হয়েছে। নেওয়া হয়েছে ১১ দফা কর্মসূচি।

Hundred hours of Astronomy : ২ থেকে ৫ এপ্রিল, ২০০৯ — ১০০ ঘণ্টা সাধারণ মানুষকে দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশ দেখার সুযোগ করে দেওয়া।

Galileoscope : গ্যালিলিওস্কোপ গ্যালিলিওর দূরবীনের মতো। তবে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত ও আধুনিক। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে আগামী এক বছরে প্রায় ১০ লক্ষ গ্যালিলিওস্কোপ বিতরণ করা হবে সর্বসাধারণ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যাতে তারা আকাশ দেখার ও চেনার সুযোগ পায়।

Cosmic Diary : বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পাতায় ধরা থাকবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কর্মধারা।

Portal to the Universe : জ্যোতিবিজ্ঞানের দৈনন্দিন খবরাখবর, আধুনিক দূরবীনের সাহায্যে তোলা মহাকাশের ছবি, বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনা, বিশ্বের প্রধান মানমন্দিরগুলোর নির্দেশিকা এবং বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার রূপরেখা সমৃদ্ধ একটি তথ্যভাণ্ডার গড়া হবে।

She is an Astronomer : পেশাদারী এবং শখের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই প্রচেষ্টা।

Dark Skies Awareness : এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলোক দূষণমুক্ত রাতের আকাশের আসল সৌন্দর্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।

Astronomy and world Heritage site : মহাকাশকে জানার প্রচেষ্টায়, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, অতীতে বহু পুরাকীর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা, সচেতন করা এবং পুরাকীর্তিগুলিকে সংরক্ষণ করা এই কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

Galileo Teachers Training Programme : এটি হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচী। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবেন।

Universe Awareness : আর্থিক অসামর্থ, গরীব ও উন্নয়নশীল দেশের শিশু, কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীদের মহাকাশ চর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই দিকটার প্রতি নজর দিতেই এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে UNESCO।

From Earth to Universe : মহাকাশের বৈজ্ঞানিক দিকগুলোকে তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। বিভিন্ন পার্ক, স্টেশন ও আর্ট গ্যালারীতে মহাকাশের আকর্ষণীয় ছবি ও তথ্যের প্রদর্শনী করা হবে।

Developing Astronomy Globally : বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশ্বায়ন ঘটানো হবে। পেশাদারী, শিক্ষামূলক এবং জনপ্রিয় — এই তিনটি স্তরে এই প্রচেষ্টা চলবে। শুধু এই নয়। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষের মূলমন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়ে এবং এই বর্ষ পালনের উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখে, সাধ্যের মধ্যে থেকে যেকোন প্রকার কর্মসূচী পালন করা যেতেই পারে।

— গোবিন্দ দাস, ৯৩৩২৪৩১১০২

মুখে মুখে বর্গ

কমল বিকাশ ভট্টাচার্য

কোনো সংখ্যার বর্গ করতে হলে আমরা সংখ্যাটাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে থাকি। ছোট ছোট সংখ্যার ক্ষেত্রে মুখে মুখে বর্গ বের করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে বড় বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে খাতা, পেন্সিল, চক না নিয়ে বসলে অসুবিধা আছে। বড় বড় গুণ মুখে মুখে করা বেশ শক্ত। একটা সহজ পদ্ধতি জানা থাকলে তোমরাও যেসব সংখ্যার এককের অঙ্ক 5, সেইসব সংখা বড় হলেও তার বর্গ বলে দিতে পারবে। যেমন, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 205 ইত্যাদি সংখ্যাগুলির বর্গ খুব সহজেই মুখে মুখে বলা যায়।

ভাবছ, কি করে এটা সম্ভব? ধরা যাক, 35-এর বর্গ বের করতে হবে। 35 সংখ্যাটির এককের অঙ্ক 5। প্রথমে 5 এর বর্গ করতে হবে। 5 এর বর্গ মানে হবে 5×5 = 25। এবার 5 এর বাঁ-দিকে অর্থাৎ দশকের ঘরের অঙ্ক 3-কে তার ঠিক পরবর্তী সংখ্যা 4 দিয়ে গুণ করতে হবে। এই গুণফল হবে 3×4 = 12। এই সংখ্যাটি 25 (5×5) এর বাঁ-দিকে বসালে পাওয়া যাবে 1225। 35 × 35 অর্থাৎ $(35)^2$ করে দেখ এই সংখ্যাটিই পাবে।

আরেকটি সংখ্যার বর্গ বের করা যাক। ধরা যাক সংখ্যাটি 85।
প্রথমে 5 এর বর্গ = $5^2 = 5 \times 5 = 25$
এবার নিয়মানুযায়ী, 5 এর বাঁ-দিকের সংখ্যা ৮ কে পরবর্তী সংখ্যা ৯ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে 8×9 = 72
অতএব $(85)^2 = 7225$
আশাকরি নিয়মটা বুঝতে পেরেছ। আর এও বুঝেছ, কোনো সংখ্যার এককের অঙ্ক ৫ হলে সেই সংখ্যাটির বর্গ মুখে মুখে হিসেব কষে কীভাবে বের করতে হয়।

আরও কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক ঃ

45-এর বর্গ 5×5 = 25, 4×5 = 20, ∴ $(45)^2 = 2025$

95 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 9 x 10 = 90, ∴ $(95)^2 = 9025$

115 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 11 x 12 = 132, ∴ $(115)^2 = 13225$

305 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 30 x 31 = 930, ∴ $(305)^2 = 93025$

1005 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 100 x 101 = 10100, ∴ $(1005)^2 = 1010025$

দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে এককের সংখ্যাটি অবশ্যই ৫ হতে হবে। যেমন —

14.5 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 14 x 15 = 210, $(14.5)^2 = 210.25$

1.45 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 14 x 15 = 210, $(1.45)^2 = 2.1025$

20.5 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 20 x 21 = 420, $(20.5)^2 = 420.25$

2.05 - এর বর্গ
5 x 5 = 25, 20 x 21 = 420, $(2.05)^2 = 4.2015$

আশাকরি পদ্ধতিটা ভালভাবে বুঝতে পেরেছ। আরেকবার মনে করে দিই, এই পদ্ধতিটা প্রযোজ্য সেইসব সংখ্যার ক্ষেত্রে যাদের এককের অঙ্ক ৫; অন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়।

পাঠকের মতামত

মাননীয় সুজনেষু,

অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাই। সেপ্টেঃ-অক্টোবর, ২০০৯ সংখ্যা পত্রিকা তথা পত্রিকার প্যাকেট পেয়েছি। মুক্ত মনের আলোকে একটি ক্ষুদ্র চিঠি পাঠালাম। প্রকাশে বাধিত হব। শিশু জন্মের পর থেকে যে পরিমন্ডলে মানুষ হয়ে ওঠে সেই পরিমন্ডল শুধু মেনে নিতে শেখায়, প্রশ্ন করতে শেখায়না। জ্যোতিষ বিরোধিতার উপযুক্ত যুক্তি হিসেবে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বর উক্তি দেওয়া কি বাঞ্ছনীয়? জ্যোতিষশাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণী যুক্তি কি এতটাই দেউলিয়া? যীশুখ্রিস্ট থেকে চৈতন্য, বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ, মহম্মদ থেকে মহাবীর সকলেই প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। এমনকি বহু নিন্দিত মনু, যিনি নারী ও শূদ্রদের পশুর সারিতে ঠাঁই দিয়েছেন তিনিও ধর্মের ১০টি লক্ষণের কথা বলেছেন। বুদ্ধও ধর্মের পথে ৮টি মার্গের কথা বলেছেন। বিনয়, করুণা, ব্রহ্মচর্য, আস্তেয় (অক্রোধ) ইত্যাদি আটটি শীল বা আচরণবিধি। ভারতবর্ষ নাকি ধর্মের দেশ, এদেশের মানুষ নাকি ধর্মভীরু। জেলখানাগুলিতে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে সেখানে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। কেউ খুনী, কেউ চোর, কেউ ডাকাত, কেউ ধর্ষক ইত্যাদি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী; কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আর বর্তমান সভ্যতার সঙ্কটগুলি ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে নিরসন করা যাবে কি? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান আন্দোলনও শ্রেণি নিরপেক্ষ নয়। বুদ্ধ তার জীবনকালেই অনেক রাজাকে শিষ্য হিসেবে পেয়েছিলেন। ধর্মীয় নেতারা অনেক সময় চাষী-কারিগরদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে আন্দোলনে নামেন বটে কিন্তু শোষিত মানুষেরা যখন ধর্মের আশ্রয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন আর ধর্মীয় নেতারা তাঁদের ক্ষোভকে প্রশমিত করে অন্যখাতে বইয়ে দিতে পারেন না তখন তাঁদের শান্তির ললিত বাণীর মুখোশটা খসে গিয়ে নখ দাঁত বেরিয়ে পড়ে। অনেক উদাহরণ আছে। বিস্তৃত লেখার সুযোগ নেই। চন্ডাশোক যখন ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছেন, অহিংসার মহাপূজারী, জীবের দুঃখে কাতর, পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্মদূত পাঠাচ্ছেন, শিলালিপিতে অহিংসার বাণী শোনাচ্ছেন, সেইসময় বুদ্ধমূর্তির অপমানের অজুহাতে পুনড্রবর্ধনের আঠারো হাজার আজীবিককে হত্যা করলেন। সর্বকালে ধর্মের অপমানের অজুহাতে শাসকেরা যেমন-বিরোধী কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়, ঠিক একই উপায়ে মহান ধর্মাশোক উপজাতিদের বিদ্রোহকে ঠান্ডা করেছিলেন। এই হলো প্রগতিশীল ধর্মীয় আন্দোলনের নমুনা! অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন এতে বুদ্ধদেবের দোষ কোথায়? না তাঁর দোষ নেই।

এরপর 7 পাতায়

আঙুরের বিচিত্র কাহিনী

1 পাতার পর

আঙুর চাষের প্রথম প্রচলন করে। দেশ বিভাগের পূর্বে আঙুরের উৎপাদন আমাদের দেশে প্রয়োজন মতো ছিল, কেননা বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই এর চাষ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও কিশমিশ-মনাক্কা বরাবরই আফগানিস্তান থেকে আমদানি করা হত। বর্তমানে হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে প্রধানত এর চাষ হয়ে থাকে, যদিও ভারতের বহু স্থানে চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর।

উর্বরা সরস মাটি, দোআঁশ পাথুরে মাটি এবং জলনিকাশী জমি আঙুর চাষের উপযোগী। সামান্যতম বৃষ্টি অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি ২০-২৫ সেন্টিমিটার মাত্র, সেখানেও এর পূর্বেই যাতে ফল পাকে সেইসকল জাতীয় আঙুরই সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা চলে। ভারতে বর্তমানে আনাব-ই-শাহী আঙুরই সর্বোৎকৃষ্ট বলে প্রসিদ্ধ এবং এর চাষ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রচুর ফলন এবং লাভের দরুণ এর উৎপত্তির স্থান হায়দরাবাদ থেকে দ্রুত সমস্ত দক্ষিণ ভারতে, এমনকি মহারাষ্ট্রেও প্রসার লাভ করেছে। এক একর চাষ করে ১০-১২ হাজার টাকার আঙুর বিক্রয় সম্ভব। এছাড়াও বোখরী, কান্দাহারী, কালো সমকট ইত্যাদিও সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা যায়। দিল্লী ও পাঞ্জাবেও আঙুরের চাষ প্রসার লাভ করেছে। হিমাচল প্রদেশে কিশমিশের উপযোগী আঙুর চাষের প্রচেষ্টা সাফল্য পেয়েছে। পশ্চিম বাংলায় এই অঞ্চলের উপযোগী আঙুরের অনুসন্ধান চলছে এবং কিছুটা সাফল্য লাভ করা গেছে।

আঙুরের পুরোনো ডাল কেটে মাটিতে বসিয়ে নতুন চারা উৎপাদন করা হয়। এক বছরের পুরোনো কাটিং ৬-৭ হাত অন্তর গর্তে, বসানো হয়। গাছ মাটিতে লেগে যাওয়ার পর গ্রীষ্মকালে আগাছামুক্ত করে সেচ দেওয়া উচিত। আঙুরের লতা সাধারণতঃ কংক্রিটের অথবা লোহার স্থায়ী মাচানের উপর উঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লতা ছাঁটাই করতে হয়, যাতে নতুন লতা বের হয়ে ফুল ও ফল ধরে।

রোগ দমন একটি প্রধান কাজ এবং সর্বত্রই 'বোর্দো মিশ্রণ' ধারাবাহিকভাবে সিঞ্চন করা হয়। পোকা দমনের জন্য একইসঙ্গে খোলা ডি ডি টি সিঞ্চন করা হয়। সম্পূর্ণ পাকবার পরই গাছ থেকে আঙুর তোলা হয়, কারণ তোলার পর অন্য ফলের মতো আঙুরের মিষ্টত্ব ও স্বাদের কোনও উন্নতি হয় না। বিভিন্ন জাতির আঙুরের পাকবার সময় বিভিন্ন এবং রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফলের থোকা কাঁচি বা ধারালো ছুরি দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কেটে সযত্নে ঝুড়ির নীচে কিছু ঘাস-পাতা বিছিয়ে তার মধ্যে রাখা উচিত। কাঁচা, বেশি পাকা বা ক্ষতিগ্রস্ত ফল ফেলে ভালো ফল ঝুড়িতে বা কাঠের বাক্সে রাখতে হবে।

প্রথম দিকে ফলন একর প্রতি ২-৩ হাজার কিলোগ্রাম হলেও ক্রমে গড়পড়তা ফলন প্রায় ৫ হাজার কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে ফুল ফোটার পর জিব্বারেলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে, অল্প ব্যয়ে ফলন প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড, পেনিসিলিনের মতোই ধানগাছ আক্রমণকারী ছত্রাক 'জিব্বারেলিক অ্যাসিড ৫০ পি পি এম প্রয়োগেই ভালো ফলন পাওয়া যায়। এই মাত্রার প্রয়োগ মানুষ বা অন্য কারও পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

— শৈবাল কুমার গুহ, ২৫৫৬-৩৯১০

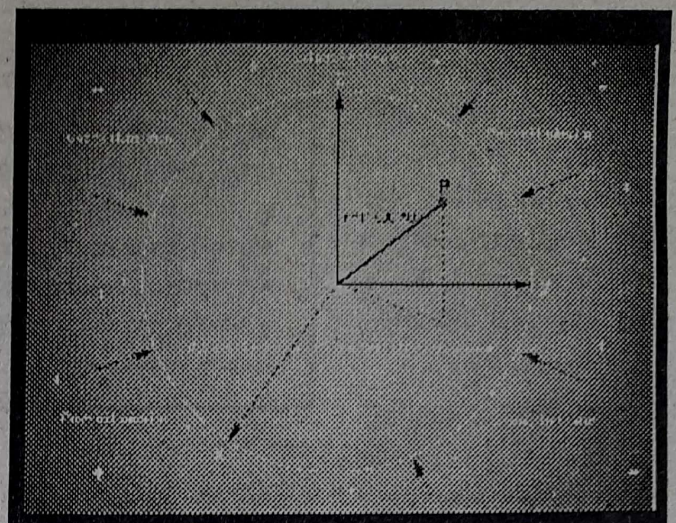

পাঠকের মতামত

6 পাতার পর

কিন্তু কথাটা হলো পৃথিবীর সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই আর্ত, দরিদ্রকে দান করার কথা বলেছেন; যিনি দান করছেন তার ধর্ম না হয় রক্ষিত হচ্ছে কিন্তু যে আর্ত বা দরিদ্র দু'হাত পেতে দান গ্রহণ করছেন, তাঁর ধর্ম কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে? পৃথিবীর কোনও আহ্বান করেনি, হে মানুষ তোমরা এমন একটি সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাও — যে সমাজ আর্ত বা দরিদ্র থাকবে না, কাউকেই হাত পেতে দান নিতে যেন না হয়। বুদ্ধের জীবনকালেই যে রাজারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রেমের বাণীতে বিগলিত হননি, এটা তাদের কূট কৌশল — আমজনতাকে প্রেমের বাণী দিয়ে তাঁবে রাখতে। আর যুগে যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম শাসক ও শোষকের শোষণের হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাস তাই বলে। শুরুর নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের মাঝেও শাখা রয়েছে। কোনটি মানুষ মানবে? নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকে খুচরো ও পাইকারী ধর্মব্যবসায়ীরা অবতার বানিয়ে ছেড়েছে। বুদ্ধের বাণী কতটা মানা হচ্ছে? বরঞ্চ অবতার বানিয়ে পূজো, আরাধনা করা হচ্ছে। জন্মান্তরবাদের হোতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ক্ষত্রিয়রাজ প্রবাহণের মতানুসারী হয়ে বুদ্ধকে পুনর্জন্মধারী বানানো হয়েছে। মরণোত্তর দেহদানের সবচেয়ে বড় অন্তরায় ধর্মীয় বাধা।

মাননীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েও লিখছি — জ্যোতিষ বিরোধিতায় বুদ্ধদেবের উক্তি আমার কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে। অবশ্য আমার কাছে বিসদৃশ মনে হলেও তাতে কারো কিছু এসে যায় না আর সে প্রশ্নও অবান্তর। তবে জ্যোতিষ বিরোধিতার প্রশ্নে বুদ্ধদেবের একটি উক্তি টেনে আনাতে মর্মাহত। বিদগ্ধ পাঠক খোলা মনে এ বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত পত্রিকা মাধ্যমে জানালে বাধিত হবো। আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে মুক্ত মনে এ বিষয়ে পত্র বিতর্কে আগ্রহী রইলাম। (সমাজচ্যুত ফেরারী ফৌজের নির্ভীক সৈনিকদলের পশ্চাৎপর বেঞ্চের একজন ছাত্র।)

— তপন চন্দ, গ্রাঃ ও পোঃ- মাদারীহাট, জলপাইগুড়ি।

প্রশ্নোত্তর

ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থার উদ্যোগে ও বিজ্ঞান দরবার, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার সহযোগিতায় ২১ জুন, ২০০৯ শঙ্খনগর জি.এম.এফ.পি বিদ্যালয়ে 'জলদূষণ ও তার প্রতিকার' বিষয়ক এক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী সহ বিজ্ঞানকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে এবারের 'প্রশ্নোত্তর পর্ব'।

প্রশ্ন ঃ ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ কিভাবে হয়?

তনয় পাল, দশম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল। শুভম ভৌমিক, সপ্তম শ্রেণি, বাগাটী রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলী। দিব্যেন্দু দাস, অষ্টম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল।

উ ঃ আর্সেনিক দূষণের সমস্যাটি মূলত প্রাকৃতিক। ভূগর্ভস্থ জলকে তুলে নেবার ফলে জলস্তর নীচের দিকে নেমে যায়। ফলে ভূগর্ভের আর্সেনিক ঘটিত খনিজগুলিতে (যথা- আর্সেনোপাইরাইট আর্সেনেট, আর্সেনাইট) অক্সিজেন যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, আর্সেনিক জলে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। ফলে বর্ষাকালে জলস্তর বেড়ে গেলে যৌগগুলি জারিত হয়ে জলের মধ্যে মিশে যায়। আর্সেনিক দূষণ বৃদ্ধি পায়। বিক্রিয়াটি ঃ $FeS_2 + 2H_2O + 7O_2 \rightarrow 2Fe+2 + 4HSO_4$

প্রশ্ন ঃ আমাদের ব্যবহারযোগ্য জল সবই কি দূষিত?

পায়েল চন্দ, দশম শ্রেণি, বাগাটি শিবচন্দ্র ব্যানার্জী গার্লস হাইস্কুল, হুগলী। অরিন্দম হালদার, দশম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, হুগলী।

উ ঃ জলসম্পদের তিনটি উৎস — ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ও বৃষ্টিপাত। পৃথিবীর মোট জল ১৪০ কোটি ঘন কি.মি., যার ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত, ২.৩১ শতাংশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে বরফ হিসেবে এবং বাকি ০.৬৯ শতাংশ জল আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্যবহারযোগ্য জল নানাভাবে দূষিত হচ্ছে।

(১) দূষিত রাসায়নিক পদার্থগুলি যখন নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়।

(২) পেট্রোলিয়াম তেল বা তৈলজাত পদার্থ সমুদ্রের জলে মিশে যায়।

(৩) রাসায়নিক কীটনাশকগুলি বৃষ্টির জলের মাধ্যমে পুকুর বা জলাশয়গুলি দূষিত করে তোলে।

(৪) জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০টি জেলার ৮০টি ব্লকের পানীয় জল আর্সেনিক দূষণ-এর শিকার, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও দঃ দিনাজপুরে ফ্লোরাইড দূষণ বেড়েই চলেছে।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে যে পরিমাণ জলদূষণ, বায়ুদূষণ ঘটছে — এই দূষণ প্রতিরোধের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কি ভূমিকা পালন করবে?

অরিন্দম হালদার, দশম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, হুগলী, রকি দেবনাথ, দশম শ্রেণি।

উ ঃ জলদূষণ ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রীরা যা যা করতে পারে তা হল — (১) স্কুলের জমিতে পরিকল্পনা করে গাছ লাগাতে হবে। (২) স্থানীয় জলাশয়/দিঘিগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা খুব জরুরী। (৩) যানবাহনগুলি যাতে পরিবেশ দূষিণত না করে সে বিষয়ে প্রচার করতে হবে। শব্দদূষণ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (৪) পরিশ্রুত ও নিরাপদ জল পান করতে হবে। জলবাহিত রোগ যাতে না হয়, তার জন্য স্কুলে ও সর্বত্র যাতে নিরাপদ জল সরবরাহ করা হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। (৫) শিল্প-কারখানা থেকে যাতে দূষিত গ্যাস, যথা- কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড সহ বিষাক্ত গ্যাস ও দূষিত আবর্জনা যাতে পরিবেশে মিশতে না পারে সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

(৬) কারখানা থেকে দূষিত আবর্জনা যাতে নদীর জলকে দূষিত করতে না পারে।

উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩০২২৮৯৬৬

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, নয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বালুরঘাট, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, ৯৮৩২৪৬৩৪১৬

নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান ফিউম্যান ডেভেলপ।

✆ 25890019(R), 9433977495

Subrata Das

D.M. Club Member Agent, LICI (Kalyani Branch)

: Residence :

Purbasha, Gokulpur, P.O. Kantaganj- 741250

পত্রিকা সহযোগী সংস্থা ঃ বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, নীলকুঠি ওয়েল ফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট, কোচবিহার, জংশন ওয়েলফোর অরগানাইজেশন, আলিপুর দুয়ার জং, দিশারী সংকল্প বালুর ঘাট, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি, দমদম সায়েন্স ক্লাব, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যাদবপুর।

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী — সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in